অন্ধ অনুকরণ করে বিপ্লব করা যায় না

সংশোধনবাদকে কেন্দ্র করে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে নানা বিভ্রান্তি ও দিশাহারা অবস্থা দেখা দিয়েছিল। যেমন পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ, বিভিন্ন সাম্যবাদী পার্টিগুলির মধ্যে বিশেষত নেতৃত্বকারী ও অন্যদলগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় ইত্যাদি। মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে কীভাবে মোকাবিলা করতে পারি সে সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ভাষণে আলোচনা করেছেন। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আর একটি বিষয়ও তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন — তা হল বিপ্লবীদের আচরণবিধি, শৃঙ্খলা ও কর্মপদ্ধতি। আমাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপকে বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখী করে পরিচালনা করার প্রশ্নে এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা।

কমরেড সভাপতি ও উপস্থিত কমরেডস,

এতক্ষণ আপনারা নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও শিক্ষার নানা দিক সম্পর্কে বিভিন্ন নেতাদের আলোচনা শুনলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা বহু দিক বিস্তৃত, বহু শিক্ষা তার থেকে আমাদের নেওয়ার আছে। কিছু কিছু দিক পূর্ববর্তী নেতারা আলোচনা করেছেন। আরও অনেক বিষয় আছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবস্থাটি বিশেষ করে পর্যালোচনা করার দরকার আছে। কিন্তু, আমার শরীর খুব ভাল নয়, আমি অত বিস্তৃত আলোচনায় যাব না। গুটিকয়েক কথা এবং গুটিকয়েক দিক যা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দরকারি, আমাদের আশু প্রয়োজন, আজ সেটুকুই আপনাদের সামনে আলোচনা করব।

নভেম্বর বিপ্লবের বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যেটা এখনই আমাদের দেশের সমস্ত বিপ্লবী কর্মীদের, জনসাধারণের এবং কমিউনিস্টদের আর একবার স্মরণ করা দরকার তাহল, কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই নকল করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। যাঁরা করেন তাঁরা যদি ভাবেনও নকল করবেন না, তবুও অথরিটি-কে হুবহু নকল করে তাঁদের কথাগুলো আউড়ে চলবার বদভ্যাস, এ শুরু থেকেই দীর্ঘদিন যাবৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে বারবার প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। আর বারবার সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্বকে তার বিরুদ্ধে লড়াইও করতে হয়েছে। এক সময়ে লেনিনকেও লড়াই করতে হয়েছিল। রাশিয়ার বিপ্লবের সময় এরকম একটা ঝোঁক প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইনটেলেকচুয়ালরা মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর বই খুঁজে পুঁথিগতভাবে তা মুখস্থ করে, হুবহু নকল করে রাশিয়ায় বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ বিপ্লব ম্যানুফ্যাকচার (কারখানায় তৈরি) করতে চেয়েছিলেন। এঁদের উদ্দেশে লেনিন বলেছিলেন, বিপ্লব একটি ঘটনা প্রবাহ, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা গড়ে ওঠে, কারখানায় মাল তৈরি করার মতো আমরা খুশিমত বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারি না।

প্রতিটি দেশের বিপ্লবেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে

বিপ্লবী তত্ত্বের যাঁরা উদ্‌গাতা, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে একে বিকশিত করেছেন, বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তত্ত্বকে উন্নততর করেছেন, তাঁরা তাঁদের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে সকল নতুন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন সেই তত্ত্বগুলোকে আমাদের আয়ত্ত করা খুব দরকার। কিন্তু, মনে রাখা প্রয়োজন, প্রতিটি বিপ্লবেরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, ধরন আছে। প্রতিটি বিপ্লবী তত্ত্বই কোনও না কোনও বিশেষ বিপ্লবের তত্ত্ব এবং সেটা তদানীন্তন সাধারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও বিশেষ পরিস্থিতিতে তার বিশেষীকৃত প্রয়োগের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বোঝা দরকার যে, যেহেতু অবস্থা পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন দেশের অবস্থাও হুবহু এক নয়, সেহেতু বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের জটিল প্রক্রিয়াগুলোও হুবহু এক নয় এবং হতেও পারে না। এভাবে বিষয়কে না বুঝলে তা হবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিরোধী। তাই যাঁরা মার্কস, এঙ্গেলস বা তাঁদের পর্যায়ের বিভিন্ন অথরিটির শিক্ষাগুলিকে 'কোট'

(উদ্ধৃত) করার ক্ষমতা রাখেন তাঁদের হুঁশিয়ারি দিয়ে লেনিন বলেছিলেন, আমরা মনে করি, মার্কসের কোনও তত্ত্ব চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয় নয়। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মার্কস কেবলমাত্র মার্কসবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে বিজ্ঞানকে সমাজতন্ত্রীদের অবশ্যই সমস্ত দিকে বিকশিত করতে হবে যদি তারা সময়ের গতিপ্রবাহে পিছিয়ে পড়তে না চায়। আমরা মনে করি, মার্কসের তত্ত্বকে রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিকশিত করা রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, এই তত্ত্ব কতকগুলো সাধারণ শিক্ষা ও নীতিকেই তুলে ধরেছে যা ব্রিটেনের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী যেভাবে প্রযোজ্য হবে ফ্রান্সে তা হবে না, আবার জার্মানিতে যেভাবে হবে রাশিয়াতে সেভাবে হবে না।*

লেনিন বলেছিলেন, মার্কস, এঙ্গেলস বা বিভিন্ন বিপ্লবীরা যে তত্ত্ব, যে শিক্ষা রেখে গেছেন তা আমাদের সামনে রয়েছে। অর্থাৎ, মার্কসবাদের শিক্ষা আমাদের সামনে রয়েছে, তার বিশ্লেষণ রয়েছে, বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদী বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত যে তত্ত্ব এবং শিক্ষা তাও আমাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু, সেই তত্ত্ব ও শিক্ষাগুলোকে বাস্তবে রাশিয়ার বিপ্লবকে গড়ে তোলার মতো উপযুক্ত করে কাজে লাগাতে হলে তাদের এমনভাবে বিশেষীকৃত করতে হবে, বিকশিত করতে হবে, উন্নত করতে হবে, যাতে রাশিয়ার বিপ্লবের প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করা যায়। তিনি আরও দেখিয়েছেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনও দু'টি ফেনোমেনা (ঘটনা) এক নয়। কাজেই বিভিন্ন দেশের বিপ্লবগুলো যেগুলো জাতীয় পরিধির মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে সেগুলো হুবহু এক নয়। যদিও তাদের সাধারণ কতকগুলো সাদৃশ্য বা কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তবুও বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে, প্রতিটি দেশের নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আছে। কোনও দেশের নিজস্ব এই বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক ঠিক মতো বুঝে, তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করে, যদি সেই তত্ত্বগুলোকে আমরা সেই বিশেষ দেশে প্রয়োগ করতে পারি তবেই বাস্তবে দেখা যাবে, সেগুলো বিকশিত হচ্ছে, উন্নত হচ্ছে ও সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে। অর্থাৎ, সেগুলো ঠিক মার্কস যা বলেছিলেন বা অন্যান্য বিপ্লবীরা যা বলেছিলেন, হুবহু আর তা নেই। এইভাবেই সমস্ত বিপ্লবী তত্ত্বের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে।

মার্কসবাদের সাধারণ সত্যগুলোকে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষীকৃত করতে হবে

লেনিন এই শিক্ষাটি সর্বপ্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরলেন যে, বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতিরেকে বিপ্লব হতে পারে না। আর, এই বিপ্লবী তত্ত্ব হচ্ছে একটি দেশের বিপ্লবের বাস্তব প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার তত্ত্ব, তা মুখস্থ করে বই লেখবার জন্য নয়, বাহাদুরি জাহির করবার জন্য নয়, বা নকলনবিশী করবার জন্য নয়। ফলে, মার্কসবাদের যে বিজ্ঞান মার্কস ও এঙ্গেলস দিয়ে গেছেন বা পরবর্তী সময়ে লেনিন মার্কসবাদের ভাণ্ডারে যা সংযোজন করেছেন, সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, সেই লেনিনীয় শিক্ষা বা তারও পরবর্তী সময়ে স্ট্যালিন যা উন্নত করে গেছেন, বা চীনের বিপ্লবে মাও সে-তুঙ যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন — আজ বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা যাঁরা এখনও বিপ্লব করতে পারেননি, তাঁরা যদি তাঁর তাঁর দেশের বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চান, তাহলে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ-এর সেই শিক্ষাগুলোকেও তাঁদেরও একইভাবে বিকশিত, উন্নীত ও বিশেষীকৃত করতে হবে, যাতে এই শিক্ষাগুলি তাঁদের নিজ নিজ দেশের বিপ্লবী লক্ষ্যের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে।

নকল করে, হুবহু সেগুলো আউড়ে, কোনও দেশের বিপ্লব হবে না। কিন্তু, এ অভ্যাসটি রাশিয়ার বিপ্লবেও একদলের ছিল। লেনিন তার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত করে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করেছেন, বিকশিত করেছেন, তদানীন্তন বিশ্বপরিস্থিতির উপযুক্ত করে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন, উন্নত করেছেন এবং রাশিয়ার বিপ্লবে তাকে প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তী সময়ে স্ট্যালিন ঠিক সেই কাজটি করেছেন এবং মাও সে-তুংকেও ঠিক তাই করতে হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকে তাঁদের সমসাময়িক পরিস্থিতির বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার মতো করে এ সকল তত্ত্বকে যতটা বিকশিত ও বিশেষীকৃত করতে পেরেছেন ততটাই তাঁরা সে কাজে সফল হয়েছেন। আর, যেসব ক্ষেত্রে তাঁদের মতো নেতারাও বিশেষীকৃত ও বিকশিত করতে সক্ষম হননি, সেসব ক্ষেত্রে তাঁদের সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে।

** কালেক্‌টেড ওয়ার্কস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৯১-১৯২*

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট নামধারী পার্টি দু'টির ইতিহাস বারবার অন্ধ অনুকরণের ইতিহাস

প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় অন্ধ অনুকরণের যে ঝোঁকের বিরুদ্ধে লেনিন লড়াই করেছিলেন, আমাদের দেশের দু'টি কমিউনিস্ট নামধারী পার্টি, অর্থাৎ, সি পি আই ও সি পি আই (এম) জন্মের পর থেকেই সেই একই রোগে ভুগছে। আজও সেই রোগ কাটেনি। আসলে রোগের চিকিৎসা না হলে যত দিন যায় রোগ একেবারে মজ্জায় চলে যায়, তা নার্ভকে আক্রমণ করে। তখন সে রোগ সারানো দুঃসাধ্য হয়ে যায়, হয়তো বা সারানোই যায় না। রোগ যখন ধরা পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা হলে, প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারাই রোগমুক্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু, চিকিৎসায় অবহেলা করে, রোগকে বেশ আদরে যত্নে খাইয়ে-দাইয়ে যদি পাকিয়ে তোলা যায়, তাহলে রোগ একেবারে হাড়ে গিয়ে পৌঁছে মজ্জাতে চলে যায়। তখন রোগমুক্তি ঘটে না।

এই যে দু'টি কমিউনিস্ট নামের পার্টি আমাদের দেশে দেখছেন, এরা একটাই দু'টোয় বিভক্ত হয়েছে, আবার এখন তিনটে হতে চলল। এই তৃতীয়টি যদি স্থিতিলাভ করে, তাহলে চতুর্থও হল বলে। এ প্রক্রিয়ার শেষ নেই। কারণ, রোগ যখন গোড়ায় হয়েছিল তাকে ধরবার চেষ্টা হয়নি। কেউ কেউ যদি ধরাবার চেষ্টা করে থাকেন, শেখবার মন নিয়ে এঁরা তাঁদের সমালোচনা শোনেননি এবং নিজেদের শোধরাবার চেষ্টা করেননি। অর্থাৎ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীদের মতো, মার্কসবাদীদের মতো তাঁরা আচরণ করেননি। অপরের সমালোচনার মধ্যে সত্য আছে কিনা, তা কার্যকরী কিনা, বিরুদ্ধ সমালোচনা হলেও সত্যিই তার থেকে শেখবার কিছু আছে কিনা, অথবা সবটাই গালাগালি কি না, ইচ্ছাকৃতভাবে কালিমালিপ্ত করার জন্য বলা হচ্ছে কি না, সেটা আগে বুঝতে হবে। ধৈর্যের সাথে শেখবার মন নিয়ে সেটা দেখার পর যদি দেখা যায় কালিমালিপ্ত করার জন্যই তা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা হচ্ছে, তাহলে সে তা বর্জন করবে। কিন্তু, শেখবার মনই যদি না থাকে, তাহলে সমালোচনা থেকে নেওয়ার থাকলেও কিছু নেওয়া যায় না।

এই পার্টি দু'টোর বিরুদ্ধপক্ষের সমালোচনা থেকে শেখবার কোনও মনই নেই। এঁরা এমন একটি মানসিকতা গোড়ার থেকেই দলের কর্মীদের ভিতর গড়ে তুলেছেন যে, তাঁরা অপর দলের কাগজপত্র পড়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। অপর দলের মতামত জানবার কোনও প্রয়োজনীয়তা এঁদের নেই, যেন এঁরা যা বলছেন, যা ব্যাখ্যা করছেন, সেটাই বেদবাক্য। ফল কী দাঁড়িয়েছে? যখন কমিউনিস্ট আন্দোলনে, তার ভুলভ্রান্তি যাই থাকুক, বিভেদ ছিল না, তখন দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্ব সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণাবশত এঁরা স্ট্যালিন যা বলেছেন, বা রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যা বলেছে, তা হুবহু আউড়ে গেছেন বা তাঁদের নকল করেছেন। তাঁদের কথা, তাঁদের বিশ্লেষণ, তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া এক জিনিস, আর, তাঁরা আমাদের দেশের বিপ্লবের তত্ত্ব বাতলে দেবেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

ইদানীং এঁদের ঘরের খবর কিছু কিছু বেরোচ্ছে। এমন কাণ্ডও ঘটেছে যে, স্ট্যালিনকে গিয়ে এঁরা নাকি অনুরোধ করেছিলেন, আপনি আমাদের থিসিস্ তৈরি করে দিন। ভাবখানা অনেকটা এইরকম যে, আমাদের বড় ঝঞ্ঝাট হয়, আমরা যা করি তাতেই গণ্ডগোল হয়, নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার মীমাংসা হয় না, তা আপনি যখন উপস্থিত রয়েছেন, আপনার তো ভুল হতে পারে না, সুতরাং আপনি আমাদের দেশের বিপ্লবের তত্ত্বটি, তার রণনীতিটি তৈরি করে দিন। আমরা দেশে ফিরে গিয়ে ভাল ছেলের মতো বিপ্লব করি। তা স্ট্যালিনের কাণ্ডজ্ঞান তো আর এঁদের মতো ছিল না। স্ট্যালিন বলেছিলেন, বাপু হে, বিপ্লবটা যখন তোমরা করবে, ও কর্মটিও তোমরা কর, আমি করতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমাদের পরামর্শ হতে পারে, মতের বিনিময় হতে পারে, কিন্তু তোমাদের বিপ্লবের তত্ত্ব তৈরি করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই, ও কর্ম আমার দ্বারা হবে না। তোমাদের অন্য লোক খুঁজতে হবে। তা, আমাদের দেশের কমিউনিস্ট নামের এই পার্টি আগাগোড়া এইভাবেই কাজ করে এসেছে, আজও ওঁদের এই অভ্যাস যায়নি।

সি পি আই ভেঙে সি পি আই (এম) গঠনের পিছনে কোনও মূল তত্ত্বগত বিরোধ ছিল না

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে একটি নতুন কথা এসেছে — নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই জনগণতান্ত্রিক বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব কেন এল,

কিসের থেকে এল, কোন কোন দেশে তা প্রযোজ্য, বা কী ভাবে তা প্রযোজ্য, অত কথা দেখা বা বোঝার ওঁদের দরকার নেই। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যখন জনগণতান্ত্রিক বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের একটি লাইন হিসাবে জোরের সঙ্গে রাখা হল, তখন ভারতবর্ষেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হুবহু তা নকল করে 'আমাদের বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' বলতে শুরু করে দিলেন। তারপর যখন আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন আমাদের দেশে এঁরাও সি পি আই এবং সি পি আই (এম) — এই দুই নামে আলাদা হলেন। সি পি আই থেকে বেরিয়ে এসে সি পি আই (এম) যখন আলাদা দল গড়ে তুলল তখন তারা সি পি আই-কে বলল, 'সংশোধনবাদী', আর, সি পি আই সি পি আই (এম)-কে বলল, 'অতি বাম'। কিন্তু, এই পার্থক্য তাদের দলের মূল রণনীতিগত স্লোগানকে স্পর্শ করল না। দু'দলেরই স্লোগান রইল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। অর্থাৎ, এঁদের একজন অপরকে শোধনবাদী, আবার অপরজন তাকে ডকট্রিনেয়ার বা উগ্র বামপন্থী বললেও মূল নীতি দু'জনের একই রইল। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিরও নীতি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, আবার যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নাম নিলেন, তাঁদেরও নীতি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বিপ্লবকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব আখ্যা দিলেও তা আসলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই নামান্তর। সে আলোচনায় আমি পরে আসছি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শোধনবাদের যে কথা এঁরা একে অপরকে বলছেন, তার সাথে দলের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতির কোনও সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, তাঁদের দলের মূল রাজনীতির সঙ্গে শোধনবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমার প্রশ্ন, সি পি আই (এম) যদি সি পি আই-কে যথার্থ শোধনবাদী গণ্য করে বর্জন করেই থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই পুরনো দলের একজন বা দু'জন নেতার শোধনবাদী আচরণ বলে করেনি, দলের মূল রাজনীতি, স্লোগান, কর্মসূচি ও নেতৃত্বের চরিত্রকে পরীক্ষা করার ভিত্তিতেই দলটাকে বর্জন করেছে। বাস্তবেও একটা দলকে আমরা কখন শোধনবাদী বলি? যখন দলের মূল রাজনীতি ও নীতি শোধনবাদী হয়, তখনই সেই দলকে বলা হয় শোধনবাদী। এঁরা কিন্তু তা বলছেন না। সি পি আই-এর রাজনৈতিক স্লোগান যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, সি পি আই (এম) তাকে শোধনবাদী বললেও তাদেরও রাজনৈতিক স্লোগান জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। তাই বলছিলাম, সি পি আই-এর বিরুদ্ধে শোধনবাদের যে কথা সি পি আই (এম) বলছে, তার সাথে তাদের দলের রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁদের কাছে শোধনবাদ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। দলের কারওর সঙ্গে কারওর আচার-ব্যবহারের, কারওর কাউকে পছন্দ না হওয়ার ব্যাপার।

আর একটা ব্যাপার হতে পারে। কারণ, একটা দলের তত্ত্ব, যেটাকে তারা বিপ্লবী তত্ত্ব বলছে সেটি এবং তার সাথে দলটার প্র্যাকটিসের, অর্থাৎ বাস্তব কর্মের সামঞ্জস্য আছে কি না তা দিয়েই দলটার বিচার হয়। এখন, ব্যাপারটা এরকম হতে পারে যে, সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর তত্ত্বটা এক ঠিকই, কিন্তু প্র্যাকটিসে সি পি আই যা করছে, তত্ত্ব তা করতে বলে না। কিন্তু, সি পি আই (এম) তাও বলছে না। বলছে, ওরা শোধনবাদী। ওদের তত্ত্ব, আর তাদের তত্ত্ব এক নয়। এই কথাটা বলে তারা সমস্ত লোককে ঠকাবার চেষ্টা করছে, নিজেদেরও ঠকাচ্ছে। এমনও হতে পারে, অন্য কাউকে ঠকাতে পারছে না, নিজেরাই ঠকছে। বুঝতে পারছে না যে, সি পি আই আর তাদের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। নিজেদের তত্ত্বগত মানটা তাদের এমন স্তরে রয়েছে যে, সি পি আই-এর সঙ্গে তাঁদের পার্থক্যটা যে কতকগুলো স্লোগানে ও কথায় মাত্র, এ সত্যটা ওরা বুঝতে পারছে না। সি পি আই যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছে তাও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবই। দু'দলই মনে করে, আমাদের দেশে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীল ও বিপ্লবী ভূমিকা আছে। শুধু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সি পি আই-এর লাইন হল, এই জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে একত্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলে জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে। তারা বলছে, বিপ্লব শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে। আর, সি পি আই (এম) বলছে, না, ভারতবর্ষে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রগতিশীল ভূমিকা আছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জাতীয় ফ্রন্ট করা হবে না, তারা তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করবে, তাদের সাথে কখনও ঐক্য হবে, কখনও সংগ্রাম হবে। তাহলে ব্যাপারটা আসলে গিয়ে দাঁড়াল যে, দু'দলই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলছে, দু'দলই বলছে, ভারতের বিপ্লবের সামনে প্রধান শত্রু পুঁজিবাদ নয়, প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র, তাকে উচ্ছেদ করেই ভারতে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে নয়। অর্থাৎ, দু'দলই বলছে, ভারতের বিপ্লব হবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং সেই বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়া প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করবে। তাহলে, উভয়ের ক্ষেত্রেই বিপ্লবটা স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়াল

ন্যাশনাল (জাতীয়), সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী।

এখন, বিপ্লবটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও জাতীয় হলে তা সামন্ততন্ত্রবিরোধী হবে। কিন্তু, বিপ্লবটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, অথচ জাতীয় না হয়ে যদি সমাজতান্ত্রিক হয়, তবে তা পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব হবে। কিন্তু সি পি আই, সি পি আই (এম) দু'জনেই বলছে, তাদের বিপ্লব হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী ও জাতীয় এবং সেই বিপ্লবে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী ভূমিকা আছে। তাহলে দু'জনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? না, যেটা আমি আগে বলেছি, অর্থাৎ একদল বলছে, জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে ন্যাশনাল ফ্রন্ট (জাতীয় ফ্রন্ট) হবে, জাতীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। অপর দল বলছে, না, জাতীয় ফ্রন্ট নয়, তারা জাতীয় বুর্জোয়াকে তাদের সাথে যুক্তফ্রন্টে আনবে, কখনও ঐক্য হবে, কখনও সংগ্রাম হবে। এইভাবে জাতীয় বুর্জোয়াকে তারা ব্যবহার করে বিপ্লব করবে। তাহলে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তা এই দু'দলের মধ্যে পার্থক্যের গোটা ব্যাপারটা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে গিয়ে দাঁড়াল।

অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ সকলকেই লড়াই করতে হয়েছে

এখন, এই সি পি আই (এম) যখন সি পি আই ভেঙে এল তখন তারা এমন ভাব দেখাল যে, মাও সে-তুঙ হলেন তাদের অথরিটি। মাও সে-তুঙ অনেক সঠিক কথা বলেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান বিশ্বে তিনি বিপ্লবের জীবন্ত অনুপ্রেরণা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তিনি শুধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করছেন না, এই সংগ্রামগুলোকে মূল সংশোধনবাদী দুর্বলতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টাই শুধু করছেন না, তিনি সক্রিয়ভাবে লড়ছেন। একটা অমূল্য সংগ্রাম তিনি করছেন এবং সেই সংগ্রাম থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে।

এ কথার মানে এই নয় যে, মাও সে-তুঙ যা বলছেন সেই কথাগুলো বিনা বিচারে, বিনা বাক্যে আমাদের অন্ধের মতো অনুসরণ করতে হবে। এটা কোনও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিই নয়, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষাই তা নয়। এই প্রবণতার বিরুদ্ধেই একসময় লেনিনকে লড়তে হয়েছে, যে কথা আমি আগে বলেছি। খোদ মাও সে-তুঙকেও লড়তে হয়েছে। মাও সে-তুঙ যখন চীনে বিপ্লব গড়ে তুলেছেন তখন তাঁর সামনে ছিল মার্কস-এঙ্গেলস-এর শিক্ষা, আর ছিল যে লেনিন একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসাবে এসেছিলেন, যে লেনিনবাদ এ যুগের মার্কসবাদ, সেই লেনিনের সমস্ত শিক্ষা। এখনও মাও সে-তুঙের পার্টি বলছে, এটা লেনিনবাদের যুগ, যদিও বাচনভঙ্গির মধ্যে, বচন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটু অন্য ব্যাপার আসছে। কিন্তু, তবুও তাঁরা একথা অস্বীকার করছেন না যে, এটা মূলত লেনিনবাদের যুগ। লেনিনবাদই যে বর্তমান যুগের বিপ্লবী আন্দোলনকে ফান্ডামেন্টালি গাইড (মূলগতভাবে পরিচালনা) করবে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মূল বিশ্লেষণে একথা অস্বীকার করছে না, অন্য ঝোঁক তাদের যাই থাকুক। যাই হোক, এ বিষয়ের মধ্যে আমি আজ আর ঢুকবো না। যা বলছিলাম, তাহল, রাশিয়ার বিপ্লবে লেনিনকে অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে যেমন লড়তে হয়েছে, তেমনি লেনিনের মতোই সমানভাবে চীন বিপ্লবেও স্ট্যালিনকে অন্ধের মতো অনুকরণ করার প্রবণতার বিরুদ্ধে মাও সে-তুঙকে লড়াই করতে হয়েছে। লড়াই করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যাঁরা নকল করতে চেয়েছেন তাঁরা লেনিন ও স্ট্যালিনের উত্তরাধিকারী নন, তাঁদের যোগ্য শিষ্য নন। মাও সে-তুঙ যখন এই অন্ধতাকে লড়াই করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে কারও কারও মনে হয়েছে যে, তিনি বোধহয় লেনিন এবং স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কিন্তু, আসলে চীন দেশের মাটিতে তিনিই লেনিন-স্ট্যালিন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্যিকারের উত্তরাধিকারী এবং বিপ্লব করেই মাও সে-তুঙ তা প্রমাণ করেছেন।

নকশালপন্থীরাও অন্ধতার শিকার

আজ আবার তাঁকে নিয়ে বিশ্বে সেই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। চীনের পার্টি এবং মাও সে-তুঙকে নিয়ে দেশে দেশে আরেক দল লোক ঠিক সে কাজটিই আজ আবার করছেন। যেমন মার্কস-এঙ্গেলসকে নিয়ে একদিন হয়েছিল, লেনিনকে নিয়ে হয়েছিল, স্ট্যালিনকে নিয়ে হয়েছিল, তেমন আজ আবার মাও সে-তুঙকে নিয়ে শুরু হয়েছে। এটা শুরু হওয়ার ফলে দেখছি, আমাদের দেশে ঐ দুই পার্টি, অর্থাৎ, সি পি আই

এবং সি পি আই (এম) ছাড়া তৃতীয় যে নকশালপন্থীদের সৃষ্টি হয়েছে তাঁরা কোনও কথাই শুনতে চাইছেন না। তাঁদের ভাবখানা এমন, 'আপনি চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের চাইতে বেশি বোঝেন? চেয়ারম্যান মাও-কে অস্বীকার করা মানেই বিপ্লবের বিরোধিতা করা।' হ্যাঁ, কথাটা এক অর্থে ঠিক। কিন্তু, সমস্যা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি কী হবে তা নিয়ে। মাও সে-তুঙকে স্বীকার করা বলতে ওঁরা মনে করেন, মাও যখন যা বলেছেন, হুবহু সে কথাগুলো বলা বা উগরে যাওয়া। আর, আমরা মনে করি, মাও সে-তুঙকে স্বীকার করা মানে তাঁর শিক্ষাগুলোকে মেনে নিয়ে, তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করে পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সেই শিক্ষাগুলোকে উপলব্ধি করা এবং সেই উপলব্ধির থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশের বিপ্লবে তাকে কাজে লাগানো। আর, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেও যদি কিছু দেওয়ার থাকে, তা এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত করা, তাঁর নেতৃত্বকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা। এই প্রক্রিয়াতেই আমরা আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সঠিক পথে গড়ে তুলতে পারব এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির সংগ্রামকে সাহায্য ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারব।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য মানেই অন্ধ অনুকরণ বোঝায় না

এ প্রসঙ্গে আমি আগেও যে বিষয়টি বহুবার আলোচনা করেছি, সেটি আবার বলতে চাই। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য কথাটা যদি তাঁদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা বোঝায়, তাহলে তা কোনও মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি মনে করি, মার্কসবাদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য কথাটা কোনও অবস্থাতেই তাঁদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য বোঝায় না, বরং একই উদ্দেশ্যে সমাজপ্রগতি, মুক্তি ও বিপ্লবের জন্য লড়াইয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ, অর্থাৎ, 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যে'র ভিত্তিতে সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকে। আর, এ সম্পর্কের প্রকৃতি দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের নীতির দ্বারা নির্ধারিত। অর্থাৎ এ সম্পর্ক একই সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের সম্পর্ক। এই দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ বাস্তবে জীবন্ত রূপ নিলে তবেই একমাত্র আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের চিন্তাগত ও আদর্শগত ক্ষেত্রে বিকাশলাভের পথ উন্মুক্ত হতে পারে এবং এর দ্বারা শুধু যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বই উপকৃত হয় তাই নয়, আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাথে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্বের প্রকৃতি যদি নন-অ্যান্টাগনিস্টিক (মিলনাত্মক) চরিত্রের হয়, অর্থাৎ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের সহায়ক হয়, তাহলে এর দ্বারা উপকৃত হয়ে বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হতে সক্ষম হয়।

চীন বিপ্লবের সময় মাও-এর পূর্ববর্তী নেতারা অনেকেই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লেনিনের প্রতিটি কথা হুবহু নকল করে, উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছিলেন, যেন লেনিনের সময়ে রাশিয়ার মতো চীনেও চাষীদের একটি অংশ কুলাকে, অর্থাৎ গ্রামীণ বুর্জোয়ায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, এসব কথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের কান মলে দেওয়া দরকার। রাশিয়ার চাষীদের এক অংশ বুর্জোয়ায় পর্যবসিত হয়েছিল বলেই লেনিন তাদের বলেছিলেন বুর্জোয়া। এখন, যেহেতু লেনিন বলেছিলেন, রাশিয়ায় চাষীদের এক অংশ গ্রামীণ বুর্জোয়াতে পর্যবসিত হয়েছে সেহেতু বলতে হবে, চীনের চাষীরাও গ্রামীণ বুর্জোয়াতে পর্যবসিত হয়ে গেছে। এটা কি কোনও তত্ত্ব হল?

অন্ধ সমর্থনের দ্বারা নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা হয় না

আমাদের দেশের নকশালপন্থীরাও ঠিক ওঁদের মতোই কথা বলছেন। মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, চীনে যারা বলে, চাষীদের এক অংশ গ্রামীণ বুর্জোয়ায় পর্যবসিত হয়ে গেছে তারা চীন বিপ্লবের ক্ষতি করছে, প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিশালী করছে। মাও সে-তুঙের এই কথাকে উদ্ধৃত করে নকশালপন্থীরা বলছেন, ভারতবর্ষে যারা বলে, চাষীদের এক অংশ ধনী কৃষক বা গ্রামীণ বুর্জোয়ায় পর্যবসিত হয়ে গেছে তারা ভারতবর্ষের বিপ্লবের ক্ষতি করছে, প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিশালী করছে। তা এঁদের নিয়ে কী আর করা যাবে? কিন্তু, একটি জিনিস আমাদের করার আছে, তাহল, এই যে নকল করার প্রক্রিয়া, তা যাতে বুঝতে পারে তেমন করে দেশের মানুষকে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হবে। নকশালপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের মনোভাব হবে এরকম যে, মাও সে-তুঙকে অস্বীকার করা, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা, বা মাওকে বিরোধিতা করার অর্থ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করা — এই স্লোগানটা ঠিক। কিন্তু,

স্লোগানটাকে তাঁরা যেভাবে ব্যবহার করছেন, তাতে এই স্লোগানের যে মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তার প্রতিই তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। অর্থাৎ, তাঁরা কীভাবে নেতাকে উপস্থিত করতে হয়, কখন করতে হয়, কতটুকু করতে হয়, এগুলো কোনও কিছু খেয়াল না করে, দেশের বিশেষ পরিস্থিতিকে নজরে না রেখে যেভাবে স্থানে-অস্থানে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মাও সে-তুঙের নাম করছেন, তার ফলে এত বড় একজন নেতা এবং তাঁর যা ভাবমূর্তি, তাকে ভারতের মানুষের সামনে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। প্রতিক্রিয়ার হাতে বিপ্লবী নেতৃত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার, বিভ্রান্তিমূলক প্রচার করার সুযোগ তুলে দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, মাও সে-তুঙের বিপ্লবী তত্ত্বকে আয়ত্ত করে ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে তাকে প্রয়োগ করা মানেই হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী ভূমিকাকে স্বীকার করা, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও সে-তুঙের বিপ্লবী তত্ত্বের বিরোধিতা না করা। অন্ধের মতো তাকে অনুসরণ করলে তা বাস্তবানুগ হয় না এবং তা করে যদি তাঁরা ভারতবর্ষের বিপ্লবী প্রক্রিয়াতে বাধা সৃষ্টি করেন, তাহলে মুখে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও সে-তুঙের বিপ্লবী তত্ত্বের সমর্থক বললেও, বাস্তবে কিন্তু প্রতিক্রিয়ার হাতকেই তাঁরা শক্তিশালী করবেন। অন্ধ সমর্থনের দ্বারা নেতার হাতকে শক্তিশালী করা হয় না, বরং নেতৃত্বকে দুর্বল করা হয়। তাই তাঁদের সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে।

নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তুজগতে কোনও দু'টি ঘটনাই এক নয়

সবাই জানেন, বিপ্লবের শিক্ষায়, বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় কত সমৃদ্ধ মাও সে-তুঙ ও তাঁর পার্টি; বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় কত সমৃদ্ধ বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি — লেনিন, স্ট্যালিন। মার্কস-এঙ্গেলস থেকে শুরু করে এঁদের সবার শিক্ষা, উক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ সবই আমাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণগুলো কী? এই বিশ্লেষণগুলো হল, মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে অবস্থা বা ঘটনার উপর প্রয়োগ করে তা অনুধাবনের ফলশ্রুতি। এখন, অবস্থা পাল্টাচ্ছে, ঘটনা পাল্টাচ্ছে। কারণ, বস্তুজগত নিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে, বিজ্ঞানকে সেই পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার উপর যখনই প্রয়োগ করছি তখন সিদ্ধান্তগুলো, বিশ্লেষণগুলো পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য, পাল্টে পাল্টে যেতে বাধ্য। কিন্তু, এভাবে পাল্টে যাওয়া মানে একে অপরের বিরোধিতা করা নয়। এদের একের সাথে অপরের দ্বন্দ্ব পরস্পরের সহায়ক, অর্থাৎ আপাত অর্থে বিরোধাত্মক মনে হলেও বাস্তবে তা বিরোধাত্মক নয়, তা মিলনাত্মক। অর্থাৎ, এখানে একটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে অপর একটি সিদ্ধান্তের যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা মিলনাত্মক। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ হতে থাকলে যে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ, কোনও একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার এক বিশেষ অবস্থার উপরে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল সেটি, এবং আর একটি সিদ্ধান্ত যেটি প্রক্রিয়ার আর একটু আলাদা বিশেষ অবস্থার উপরে প্রয়োগ করে পাওয়া গেল — এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু, এই পার্থক্যের ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে তা একে অপরের সহায়ক।

একটি সিদ্ধান্ত থেকে অপর একটি সিদ্ধান্ত, আবার সেই অপরটি থেকে আর একটি সিদ্ধান্ত — এইভাবেই মার্কসবাদ ক্রমাগত বিকশিত হয়। যেমন, বিজ্ঞানের কোপার্নিকাস থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত বিকাশের যে স্তর তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু, প্রতিটি সিদ্ধান্তই তার পরবর্তী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করেছে। সেই সিদ্ধান্তটি আবার তার থেকে বিকশিত আর একটি সিদ্ধান্তে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কাজেই এদের মধ্যে যে বিরোধ তা একে অপরের সহায়ক, অর্থাৎ মিলনাত্মক। এইভাবেই, যে কথা বলছিলাম, মার্কসবাদেরও বিকাশ ঘটে।

কিন্তু, যাঁরা মার্কসবাদকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এই বাস্তব দ্বন্দ্বটিকে দেখতে পান না, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে বাস্তব দ্বন্দ্ব, সাধারণ আর বিশেষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা দেখতে পান না, বুঝতে হবে, তাঁরা দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেন না। এইভাবে বিচার না করার ফলে কী হয়? সাধারণ সত্যকে হুবহু নকল করতে গিয়ে একসময় তাঁরা কোনও একটি সাধারণ সত্যের যে মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ তারই বিরোধিতা করে বসেন। হয়তো জেনে-বুঝে করেন না, না জেনে করেন। কিন্তু, ফল তার একই হয়। না জেনে করেন বলে সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে তাঁর সম্বন্ধে সহানুভূতি দেখানো যেতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে সহানুভূতি দেখানো যাবে কী করে! এখানে তো আর সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক করে মানসিক রোগীর

চিকিৎসা হচ্ছে না যে, একটু সহানুভূতির মনোভাব দেখাব। এখানে ভুলের ফলে যে সর্বনাশ ঘটবার তা ঘটে যাবেই। সুতরাং সজ্ঞানেই করুন, আর না বুঝেই করুন, তাঁদের ভুলের ফলে বিপ্লব যখন মার খেল, প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হল, তখন সর্বনাশ বুঝে করলে যা হত, না বুঝে করেও তো সমানই ফল হল।

নকল করে প্রয়োগ করার এই যে ফল, সেটা তাঁদের এইভাবে দেখাতে হবে। সেটা দেখাতে গিয়ে আমাদের পার্টির বক্তব্য আমরা বহুবার পরিষ্কারভাবে বলেছি, বহু আলোচনা করেছি। চীন বিপ্লবের সময় চীনের পরিস্থিতি, তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সেইসময় তার রাষ্ট্রের চরিত্র, পুঁজিবাদের অবস্থান, শ্রেণী-সম্পর্ক, ওদেশে তখন জাতীয় বুর্জোয়া বলতে কাদের বোঝাত ইত্যাদি বিষয়ের উপর বহু আলোচনা হয়েছে। চীনের তখনকার অবস্থান, আর তার পাশাপাশি ভারতের বর্তমান রাষ্ট্র চরিত্র, তার গঠন, কাঠামো — অর্থাৎ রূপ ও ধরন, ভারতের কৃষিব্যবস্থার চরিত্র, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বর্তমান অবস্থা ও তার চরিত্র, ভারতবর্ষে জাতীয় বুর্জোয়া বলতে কাদের বোঝায় ইত্যাদি তুলনা করলে দেখা যাবে, দুই দেশের বৈশিষ্ট্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। বিরাট কৃষক সম্প্রদায়, দেশের বিশালতা ইত্যাদি কতকগুলো বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যে মিল আছে, যা উভয় দেশের সংগ্রামের ক্ষেত্রে সমান সুবিধাজনক। যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চলবে, তখন তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দু'দেশের একইরকম হবে। কিন্তু, বিপ্লবের মূল রণনীতিগত স্লোগান, বিপ্লবের পরিস্থিতি, বৈশিষ্ট্য, মূল শ্রেণী-সমাবেশ ইত্যাদি ব্যাপারে চীনের তখনকার অবস্থার সঙ্গে ভারতের অবস্থার মৌলিক পার্থক্য আছে।

প্রাক-বিপ্লব চীনের অর্থনীতির সাথে ভারতীয় অর্থনীতির কোনওরূপ সামঞ্জস্য নেই

চীন ছিল একটা আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। বিপ্লবের আগে নামেমাত্র নানকিং-এ একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকলেও বাস্তবে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রভাবাধীন অঞ্চলে ও বিভিন্ন 'ওয়ার লর্ড'দের অর্থাৎ যুদ্ধনায়কদের (সামন্ত প্রভুদের) অধীনে চীন দেশ শাসিত হত। কেন্দ্রীভূত উপায়ে দেশ শাসন করার মতো একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকার বলতে সেখানে কিছু ছিল না। আর, ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখানে জাতীয় সরকারের কেন্দ্রীভূত চরিত্র, অর্থাৎ সুদূর গ্রাম থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় রাজধানী পর্যন্ত সুসংবদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসন, মিলিটারি, এই নিয়ে সমগ্র দেশ জুড়ে একটা কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা বা আধুনিক ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসনযন্ত্র, যা ভারতবর্ষে আছে, যেটা প্রাক-পুঁজিবাদী স্থানীয় বিকেন্দ্রীভূত মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা নয়, এবং যা সামন্তপ্রভুদের অধীনে, কিংবা কোনও না কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাবাধীন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে নেই — চীনে এরকম ছিল না। ফলে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের চরিত্র যেখানে আধুনিক পুঁজিবাদী জাতীয় রাষ্ট্র, সেখানে চীনের রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল প্রাক-পুঁজিবাদী মধ্যযুগীয়, আধা-ঔপনিবেশিক। এই হল চীনের সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রের চরিত্রের পার্থক্য। দ্বিতীয়ত, চীনে জাতীয় বুর্জোয়া বলতে মাও সে-তুঙ শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই বলেছেন। বস্তুত, পুঁজিবাদ সেখানে সেইভাবে গড়েই ওঠেনি, বলতে গেলে শিল্পপুঁজিও তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। পুঁজিবাদ অনেকটা শৈশবে ছিল। চীনের অর্থনীতি ছিল মূলত স্থানীয় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। আর, এখানে ভারতীয় পুঁজিবাদ একটা জাতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে। এখানে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়েছে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিও এসেছে এবং এদেশের অর্থনীতিতে মিলিটারাইজেশন-এর (সামরিকীকরণের) ঝোঁক ক্রমবর্ধমান। ভারতের একচেটে পুঁজিপতিরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সংস্থা ট্রাস্ট ও কার্টেলের ছোট অংশীদারে পর্যবসিত হয়েছে। তার মানে ভারতবর্ষের পুঁজি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কিং পুঁজি ও শিল্পপুঁজির মার্জারের (মিলনের) মধ্য দিয়ে লগ্নিপুঁজি ও একটি ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি-র (ধনকুবের গোষ্ঠী) জন্ম দিয়েছে, বিদেশে লগ্নিপুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। আর, ভারতবর্ষে স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি বলতে যা ছিল, তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থাকতেই ভেঙে গেছে। যতটুকু তার ধ্বংসাবশেষ ছিল, গত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাও চুরমার হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ পর্যন্ত জানেন, এখন তার ভগ্নাংশটুকুও নেই। এমনকী শরৎবাবুর সাহিত্য পড়ে দেখুন, তা স্বাধীনতা আন্দোলনেরও কোন যুগের লেখা, সেই সাহিত্যগুলোর মধ্যেও দেখবেন, গ্রামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, গ্রামে দুধ নেই, ডিম নেই, মাছ নেই, কোনও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। শাকসব্জি, দুধ গ্রামে হয়, কিন্তু গ্রামের মানুষ তা দেখতে পায় না, চলে যায় শহরের বাজারে। এই হল স্থানীয় কৃষি অর্থনীতির চেহারা। গ্রামে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় কারিগর, যেমন তাঁতি, কুমোর ইত্যাদির আজ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাই দায় হয়ে পড়েছে। তেল বানাতো যে

কলু, তারা তো শেষ হয়েই গেছে। গ্রামীণ জীবনে কমিউনিটি লাইফ (গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন), স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভারতবর্ষে বহুদিন অতীত হয়ে গেছে। এই তো হল অবস্থা। তারপর প্রশ্ন হল, ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির রূপ কী? ভারতীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষিজাত দ্রব্যের চরিত্র কী? এদেশে ভুমি-সম্পর্ক কী চরিত্রের? ভুমিতে যে উৎপাদন হয়, যে উৎপাদনে শ্রমশক্তি নিযুক্ত হয় সেই শ্রমশক্তির চরিত্র কী? এইসব বিষয়ে আমাদের বহু আলোচনা রয়েছে।

ভারতবর্ষের অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি

আলোচনা করে আমরা দেখিয়েছি, আমাদের দেশে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী-সম্পর্কের ভিত্তিতেই উৎপাদন হচ্ছে। জমি কারখানার মতোই পুঁজিবাদী উৎপাদনের একটা উপায়ে, একটা যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং এই জমি ক্রমশই গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় শতকরা পঁচাশিভাগ মানুষ যারা সর্বহারা এবং আধা-সর্বহারার স্তরে নেমে আসছে, তাদের হাতছাড়া হয়ে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমা হচ্ছে। গ্রামীণ জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ থেকে ছয় ভাগ লোকের হাতে ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ জমি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে উৎপাদন হচ্ছে, যেগুলোকে আমরা কৃষিজাত উৎপাদন বলি, সেগুলো আজ পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। এই কৃষিজাত পণ্য, যা মালিকরা জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন করছে, সেটাও করছে তারা মালিক-মজুর, অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতেই। গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ হচ্ছে ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুর। শহরের কলকারখানার সর্বহারা মজুরের মতো এরাও সর্বহারা এবং কৃষিজাত পণ্য-উৎপাদনে এরাই প্রধান শ্রমশক্তি। এখন, এই যে ক্রমশ ভূমিহীন সর্বহারা খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্রমশ জমি কেন্দ্রীভূত হওয়া, জমির পুঁজি বিনিয়োগের উপায়ে রূপান্তরিত হওয়া, মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হওয়া, শ্রমশক্তির সর্বহারা চরিত্র অর্জন করা এবং সর্বোপরি কৃষি-উৎপাদনের জাতীয় বাজারের পণ্যে পরিণত হওয়া — এই সবগুলোই প্রমাণ করে ভারতের কৃষি অর্থনীতি মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতি। কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ব্যাপারে লেনিনের একটি মূল্যবান শিক্ষার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কৃষিতে যে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, একথা কী দিয়ে বোঝা যাবে দেখাতে গিয়ে লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যাগ্রেরিয়ান কোয়েশ্চেন ইন রাশিয়া অ্যাট দি এন্ড অব নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি'তে যে লক্ষণগুলোর কথা বলেছেন, তাহল, মুষ্টিমেয়র হাতে ক্রমাগত জমি কেন্দ্রীভূত হওয়া, ভূমিহীন খেতমজুরদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া, চাষবাসের ক্ষেত্রে ক্রমাগত মজুরির বিনিময়ে কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করা এবং সর্বোপরি কৃষিতে উৎপাদিত দ্রব্য জাতীয় পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ক্যাপিটালিস্ট ট্রেড অ্যান্ড কমার্স-এর (পুঁজিবাদী ব্যবসা-বাণিজ্যের) দ্বারা ক্রমেই কৃষি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া। সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ বলতে এখানে যতটুকু টিকে আছে, যেটা আগে বহু আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, তা হচ্ছে, এই দেশের জাতীয় নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপসমুখী হওয়ায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সংস্কারে, অভ্যাসে ও আচরণে তার প্রভাব আজও রয়ে গেছে এবং টিকিয়ে রাখা হচ্ছে।

এখন, আমাদের কৃষি অর্থনীতির যে চেহারা বা রূপ, যা একটু আগে আমি আপনাদের বললাম, তার সঙ্গে লেনিনের এই মূল্যায়নটি মিলিয়ে দেখুন। এ থেকে কি এটাই প্রমাণ হয় না, যেটা আমি আগে বললাম, অর্থাৎ, আমাদের কৃষি অর্থনীতি মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ? এই অবস্থাই প্রমাণ করে, বিপ্লবের স্তর নির্ণয় বা বিপ্লবের স্তরের প্রশ্নে চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও মৌলিক সাদৃশ্য নেই। তবে আগে যা বলেছি, অর্থাৎ, দেশের বিশালতা, দেশের জনগণের একটি বিরাট অংশ শতকরা ৭০ ভাগের কৃষক সম্প্রদায় হিসাবে অবস্থান, এইসব দিক থেকে কিছু মিল আছে। তাই বিপ্লবের লড়াই পরিচালনার কলাকৌশলের দিক থেকে, চীনের সঙ্গে, ভিয়েতনামের সঙ্গে, এরকম অনেক তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে-পড়া দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে।

আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাথে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলির ব্যর্থতা

আর, সবচেয়ে বড় কথা হল, নভেম্বর বিপ্লবের সময়ের লেনিনের উক্তিকে উদ্ধৃত করে নকশালপন্থী বন্ধুদের নকলনবিশী করা ছাড়তে বলতে হবে। বলতে হবে, তা নাহলে তাঁরা মাও সে-তুঙকে ডোবাবেন, চীনের পার্টিকে ডোবাবেন, আর আমাদের দেশের বিপ্লবকে তো ডোবাচ্ছেনই। এ হলে বিশ্ববিপ্লব তো ডুববেই,

এবং তাঁদের দ্বারা এদেশের বিপ্লবও ডুববে। নকল করে বিপ্লব হয় না, কোনও দেশেই হয় না। বিপ্লবী তত্ত্ব যেখানে যে দেশেই বিকশিত হয়ে থাকুক, তাঁরা তাকে আয়ত্ত করুন। তাকে বিশেষীকৃতরূপে প্রয়োগ করার ক্ষমতা তাঁদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে। কোনও দেশেই বিপ্লব হয় না যদি না মার্কসবাদকে, বিপ্লবের তত্ত্বকে, বিপ্লবের সাধারণ শিক্ষা — যা এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের লড়াই থেকে অর্জিত হয়েছে তাকে কোনও বিশেষ দেশের বিপ্লবীরা আয়ত্ত করে; আবার তাদের নিজেদের দেশের বিপ্লবের লক্ষ্যের এবং সে দেশের অবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর উপযোগী করে সেই সাধারণ শিক্ষাগুলোকে বিশেষীকৃতরূপে প্রয়োগ করতে না পারে। তাই প্রতিটি বিপ্লবী তত্ত্বের, তথা বিপ্লবের বিজ্ঞানের বিকাশের প্রয়োজন আছে। তাকে বিশেষীকৃতরূপে প্রয়োগ না করে, বিকশিত না করে, কেউ বিপ্লব করতে পারবে না। একথাটা ঐ নকশালপন্থী বন্ধুদের বোঝাতে হবে।

সি পি আই - সি পি আই (এম)-এর বিপ্লবের তত্ত্ব আলোচনা করার সময় আমি বহুবার বলেছি, এবং নকশালপন্থীদের সম্পর্কেও দেখিয়েছি যে, তাঁরা আজ পর্যন্ত যখনই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সবই আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের দোহাই দিয়ে করেছেন। চিরকাল হয় সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি, না হয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, অথবা আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে গৃহীত জেনারেল লাইন-এর (সাধারণ তত্ত্বের) ঠিক হুবহু কপি করে তাঁরা ভারতবর্ষের সমাজকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ও আমি আলোচনা করতে চাই, যেটিও তাঁরা মোটেই লক্ষ করেননি। যখন বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মতামত এবং অভিজ্ঞতার বিনিময় ও দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়ে একটা আন্তর্জাতিক জেনারেল লাইন গড়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে সেই বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ফান্ডামেন্টাল জেনারেল লাইন (সাধারণ মূল তত্ত্ব)। কিন্তু, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত এই সাধারণ তত্ত্ব হুবহু কপি করে কোনও দেশে বিপ্লব হতে পারে না। কারণ, এই সাধারণ তত্ত্বকে প্রতিটি দেশে প্রয়োগ করতে গেলেই, সেই দেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গে কতকগুলো পার্থক্য দেখা দেবে, অর্থাৎ দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। এই দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে সমাধান করতে সক্ষম হলেই, তবেই একটি দেশের বিশেষ পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণের পথে সেই দেশের বিপ্লবের বিশেষ লাইনটি গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেটাই হবে সেই বিশেষ বিপ্লবের বিশেষ তত্ত্ব।

সাধারণ মূল তত্ত্ব, এমনকী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পরেও সাধারণের সাথে বিশেষের এই যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যদিও সে দ্বন্দ্বের চরিত্র একে অপরের পরিপূরক, তবুও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই দুই-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আছে এবং তা সবসময়ই থাকবে। সাধারণের সাথে বিশেষের এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চরিত্রকে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী পূর্বের অবিভক্ত পার্টিটি এবং বর্তমানে তিন ভাগে বিভক্ত কোনও পার্টিই পূর্বেও ধরতে পারেনি এবং আজও ধরতে সক্ষম হচ্ছে না। তাঁরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলা মানে হচ্ছে, হুবহু সেগুলোকে কপি করা, অথবা একটু উপর উপর সংযোজন অথবা পরিবর্তন করে, বা প্রকাশভঙ্গি একটু পাল্টে সেই বিপ্লবের লাইনটিকেই আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। সি পি আই-এর জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের, আসলে যা বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক ধারাকেই প্রতিফলিত করছে, প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার তত্ত্ব, সি পি আই (এম)-এর সরাসরি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, অথবা নকশালপন্থীদের ভারতবর্ষকে আধা ঔপনিবেশিক-আধা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ব্যাখ্যা করে গ্রামে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে শহর ঘিরে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার তত্ত্বকে যদি আপনারা বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, এই তিন পার্টিই ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে আগাগোড়া আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে বা বৈঠকে গৃহীত সাধারণ তত্ত্ব, অথবা সোভিয়েট নেতৃত্ব বা চীনের নেতৃত্বের ব্যাখ্যাকেই অন্ধের মতো হুবহু অনুকরণ করেছে এবং এইভাবে ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার ঘাড়ের উপর একটা তত্ত্ব চাপিয়ে তারপর সেই তত্ত্বের সপক্ষে যুক্তি ও মনগড়া মালমশলা জোগাড় করবার চেষ্টা করেছে।

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে

এবারে অন্য একটি দিক সম্পর্কে এখানে আমি কিছু আলোচনা করে যেতে চাই। আজকাল একথাটা বলা একটা রেওয়াজ হয়েছে যে, আমাদের দলের তত্ত্ব খুব ভাল। একথাটা আমরাও শুনছি ঘুমপাড়ানি গানের

মতো। শুধু আমাদের দলের কর্মীরা একথা বলছেন তাই নয়, বাইরের লোকও বলতে শুরু করেছেন, তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কর্মীদেরও অনেকেই বলতে শুরু করেছেন। জেনুইন অ্যাপ্রিসিয়েশন থেকেই তাঁরা বলছেন। আবার, বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা আমাদের দলের নীতি ভালভাবে বোঝবার চেষ্টা করেন না, দলটাকে ভালভাবে বোঝবার চেষ্টা করেন না; পাছে চাপাচাপিতে তাঁদের অনেক নেতার আমাদের কমরেডদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয় এবং তার ফলে পাছে তাঁদের জ্ঞানের বহর, বিদ্যার বহর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে যাতে আলোচনাই করতে না হয় তাই তাঁরা আগের থেকেই বলেন, আপনাদের তত্ত্ব খুব ভাল, বিশ্লেষণ খুব ভাল। আমাদের কর্মীরাও বলেন, আমাদের বিশ্লেষণ খুব ভাল, তত্ত্ব সঠিক, খুব সঠিক। তা আমি বলি, তত্ত্ব যখন আমাদের সঠিক, তখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমান! আমাদের বিপ্লবী তত্ত্ব যখন সঠিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ যখন সঠিক, তখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে! বিপ্লব তো আপনাআপনিই হয়ে যাবে, সঠিক তত্ত্বের ফলেই বিপ্লব আপনাআপনি হয়ে যাবে! না, তা হয় না। এইজন্যই আমি দেখাতে চাইছি, নভেম্বর বিপ্লবের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী শিক্ষা হল এই যে, শুধু তত্ত্ব সঠিক হলেই হয় না, চাই তত্ত্বকে কার্যকরী করার উপযোগী শক্তিশালী বিপ্লবী দল, চাই উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাপক বিপ্লবী সংগঠক ও কর্মীবাহিনী। না হলে সঠিক তত্ত্ব আপনাআপনিই বিপ্লব করে দেবে না।

এই যে বিপ্লব সম্পর্কে মানবিক আবেদন বা মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক বড় কথা জানছি, শিখছি, কেন শিখছি? শিখছি রাজনীতি, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করার জন্য; আর, সেই রাজনীতি শ্রমিকশ্রেণী সহ সমস্ত অংশের মেহনতি মানুষকে বুঝিয়ে তাকে বিপ্লবী সংগঠনে সংঘবদ্ধ করার জন্য। তা না হলে, মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করা, সংস্কৃতি অর্জন করা, এসবের দরকার কী? মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, মহানুভবতা, প্রগাঢ় জ্ঞান, বিরাট পাণ্ডিত্য, এসবের অর্থ কী? এসবের প্রয়োজন কী, যদি সর্বহারা সংস্কৃতি কী, দলের বিশেষ রাজনীতিটা কী, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যান্য রাজনীতির সঙ্গে এই রাজনীতির লড়াই কোথায়, সে সম্পর্কে আমাদের কোনও জ্ঞান না থাকে? শুধু জয়ের মধ্যেই নয়, ব্যর্থতার মধ্যে, হতাশার মধ্যে এবং অসুবিধার মধ্যেও যদি সেই লড়াই পরিচালনা করবার ক্ষমতা আমাদের না থাকে? জয় যখন হচ্ছে তখনও, আবার যখন মার খাচ্ছি, বারবার পরাজিত হচ্ছি, এমনকী তখনও বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে দলের রাজনীতিকে আমি রূপ দিতে পারি কিনা — এই ক্ষমতা অর্জন করার জন্যই তো সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, দর্শন ইত্যাদি সব শেখা — তাই না?

বিপ্লবী আচরণ ও শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব

আর, এটি করার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য আর একটি জিনিস চাই, সেটি হচ্ছে, বিপ্লবী আচরণ ও শৃঙ্খলাবোধ। মিলিটারিতে শৃঙ্খলা মানে যাকে বলে ঠেলার নাম বাবাজি, গুঁতো দিয়ে কাজ করানো হয়। মনের থেকে কেউ মানুক আর না মানুক, যা বলছে তা করতে হবে; না হলে পয়সা পাবে না, চাকরি থাকবে না। শুধু তাই নয় একবার যদি কেউ মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছে, পালিয়ে যেতে পারবে না, কান ধরে নিয়ে আসবে, না হয় জেলে পুরে দেবে। ফলে, মিলিটারিতে লোকে ডিসিপ্লিন মেনে চলতে বাধ্য হয়।

কিন্তু, বিপ্লবী দলের শৃঙ্খলাবোধ মিলিটারির শৃঙ্খলা নয়। এখানে সে প্রশ্নই আসে না। বিপ্লবী দলে মিলিটারির মতো ব্যাপারটা নেই এ কারণে যে, এখানে ডিসিপ্লিন ভলান্টারি, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। বিপ্লবী দলে প্রয়োজনের উপলব্ধিটাও ভলান্টারি, আমরা নিজেরা বুঝেই সেটা করি। কিন্তু, শৃঙ্খলার রূপ এখানে যান্ত্রিক নয় বলে, কেউ কি তাকে সুবিধা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে ? এটা কি একটা সুবিধা বা প্রিভিলেজ?

কিন্তু, ইদানীং দলের বেশ কিছু কর্মীর আচরণ আমাকে ভাবাচ্ছে, আমি খানিকটা উদ্বিগ্ন, আই অ্যাম এ বিট ডিস্টার্বড। কারণ, আমি দেখছি, কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় কমরেড, সাধারণ কমরেডদের কথা পরে বলছি, বহুক্ষেত্রেই কোনও দায়িত্ব পালন করেন না, শুধু গল্প-আলোচনায় সময় কাটান। তাঁদের উপর কোন দায়িত্ব আছে, বা তাঁরা কী নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিচ্ছেন, একবারও এ কথাটা সেই কমরেডরা ভাবেন না। কিন্তু, দুনিয়ার কোথায় কী ঘটছে তার খবর সংগ্রহ করতে তাঁদের খুব উৎসাহ। সমস্ত বিশ্বের বিপ্লবের ভাবনাটা তাঁদের মাথায়, কিন্তু নিজের কোনও নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে কিনা তা নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। তাঁরা ভাবেন না যে, তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ কোথায়, তাঁরা নিজেরা কী দায়িত্ব পালন করেন? যদি না পালন করেন, তাহলে কাজের

যেমন ক্ষতি হয়, তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যেমন বাড়ে, তেমনি আবার তাঁদের এই অভ্যাস অপরের মধ্যে বর্তাতে পারে। এরকম হলে গোটা পার্টিতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার প্রশ্ন কিছু থাকবে না, সবটাই কর্মীদের খামখেয়ালির বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আর, এভাবে পার্টির কোনও ইউনিট কাজ করতে পারে না। কিন্তু, আমি ইদানীংকালে দেখছি, দায়িত্বশীল কমরেডরা পর্যন্ত অনেক সময় এ ধরনের আচরণ করেন। দ্বিতীয়ত, বহু নেতৃস্থানীয় কমরেড ডিসিপ্লিন জিনিসটা শেখেন না। আমাদের সমস্ত আচরণের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক আচরণবোধের দিক আছে। তাঁরা যদি সেগুলো না মানেন, তাঁদের যদি ডিসিপ্লিন না থাকে, তাহলে তাঁরা যে লোকগুলোকে জড়ো করছেন সেই লোকগুলো কী শিখবে? সেই লোকগুলো যে লড়াই করছে, সে লড়াইয়ের মূল্য কী? অসুবিধার সময় বা হঠাৎ একটা আক্রমণের মধ্যেও সমস্ত কিছু সহ্য করার ক্ষমতা ও শিক্ষা তারা কোথায় পাবে?

মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিপ্লবী কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

পছন্দ না হলেই 'রিঅ্যাক্ট' করব, আমার সঙ্গে কোনও বিষয়ে মতবিরোধ হলেই উল্টোপাল্টা বলতে থাকব, মনোমতো না হলেই আড়ালে-আবডালে আলোচনা করতে থাকব, এই যে সব পেটিবুর্জোয়াসুলভ বদভ্যাস, এগুলো আমাদের চরিত্রের নেতিবাচক দিক। আমরা সমাজ থেকে এগুলো পেয়েছি। এগুলো দেখে ভীত হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু, বোঝা দরকার, এগুলো আমাদের দুর্বলতার দিক, আমাদের ত্রুটির দিক, আমাদের চরিত্রের নেতিবাচক দিক। ফলে, এগুলো দূর করতে হবে। কিন্তু, চরিত্রের এই নেতিবাচক দিকগুলোকে দূর করার শিক্ষা আমরা কোথা থেকে পাব যদি আমরা ডিসিপ্লিন না শিখি, যদি আমাদের আচরণ বিপ্লবী কর্মীসুলভ না হয়? বিপ্লবের সামগ্রিক স্বার্থে এ শিক্ষা তো আমাদের থাকা দরকার।

এমন অনেক সময় ঘটতে পারে যে, কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কোনও বডিতে কমরেডদের মধ্যে মতবিরোধ হতে পারে, ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। কারও ভুলের জন্যও এ ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু, এক্ষেত্রে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে, যার ভুলের জন্যই হোক, হয়তো তিনি ঠিক, কিন্তু সিদ্ধান্ত তাঁর মনোমত হচ্ছে না, তা সত্ত্বেও বডি'র সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে নিতে হবে। সেখানে বিষয়টা মেজর না মাইনর, মৌলিক তত্ত্বগত বিষয় তার সাথে জড়িত, নাকি তাৎক্ষণিক সাধারণ কোনও একটা সমস্যা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার, ইত্যাদি বিষয়গুলো বিচার করেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করতে হয়। কিন্তু, এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের মনোভাব এমন হবে যে, আমার সঙ্গে মতবিরোধ হলেও আমার ডিসিপ্লিন বজায় রাখা উচিত, যাতে এটা দলের মধ্যে একটা শিক্ষা হিসাবে কাজ করতে পারে। যাতে অপরে দেখতে পায় যে, দেখ কমরেডটি নিজে যা ঠিক মনে করেছে তা নিয়ে নিজের সপক্ষে লড়বার সময় সে আলাদাভাবে লড়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর সে সিদ্ধান্ত খুশি মনে মেনে নিয়েছে। তাঁর মতটা মানা হল না বলে তখন যদি অন্য কেউ তাকে সহানুভূতি দেখাতে যায়, সে তাকে উল্টে চেপে ধরে বলে, আমি কি ওখানে ব্যক্তিগত মত জাহির করার জন্য লড়েছি? আমি যেমন বুঝেছিলাম তেমন মতামত নিয়ে আমি লড়াই করেছি। কিন্তু, এখন যে সিদ্ধান্তটা হয়েছে সেটা পার্টি সিদ্ধান্ত এবং আমরা সকলেই সে সিদ্ধান্তের শরিক। ফলে, তুমি আমাকে সহানুভূতি দেখাতে এসেছ কেন? তুমি কি মনে করছ, এসব আচরণে আমি উৎসাহ দেব? এই হবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ। এ জিনিস যদি তিনি না করেন, এই ডিসিপ্লিনবোধ যদি তাঁর না থাকে, যদি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে অন্য কমরেডরা কী শিখবে? অন্য কমরেডরা যদি দেখে যে, নেতৃস্থানীয় একজন কমরেড, বড় বড় কথা তিনি যাই বলুন, কার্যক্ষেত্রে তিনি এরকম উল্টোপাল্টা আলোচনা করেন, তাঁর মতামত নিয়ে গুজগুজ করেন, অসন্তোষ প্রকাশ করেন — তখন ঐ সমস্ত কমরেডদের উপর তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়?

আর একটা বিষয় এখানে বলব। পার্টিটা এখন বিরাট, তার মধ্যে হাজার কর্মী আসছে, অনেকরকম কর্মী আসছে। এই কর্মীদের মধ্যে কিছু কর্মী একটু ভালভাবে আছে, কারও অবস্থা ভাল, কেউ একটু ভাল চাকরি করে, কেউ হয়তো নিজে সংগঠনের পরিস্থিতি এমনভাবে গড়ে তুলেছে যাতে তার হয়তো থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তটা ভাল। আবার, বেশিরভাগ কর্মী আছে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, যারা চাষী-মজুরের ঘর থেকে এসেছে, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছে। তাদের নিজেদের ঘরে খাবার নেই, বাড়িতে খাবার নেই। অথচ, তারা দলের জন্য কাজ করছে এবং এমন একটি জায়গায় সংগঠন করছে যেখানে হয় নিজের ত্রুটির জন্য, অথবা পরিবেশের জন্য, এখনও পর্যন্ত এমন অবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি যাতে করে তাদের একটু ভাল

করে খাওয়া-থাকা চলে। এরকম সবরকমের কর্মীই দলের মধ্যে আছে এবং থাকবে। দল যত বড় হতে থাকবে, তত নানা ধরনের কর্মী সংখ্যা দিন দিন বাড়বে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের কী মানসিকতা দরকার? দরকার, যারা ভাল আছে তাদের প্রতি, যারা ভাল নেই তাদের নির্লিপ্ত মনোভাব। আবার, যারা ভাল আছে তাদের মানসিকতা এমন হওয়া চাই যে, প্রয়োজন হলে তারা সবার সাথে একত্রে কষ্ট ভোগ করতে পারে, হাসিমুখে এক কথায় সবকিছুই ছেড়ে দিতে পারে। এটা কথার কথা নয়। মন যদি অন্যরকম চায়ও, সেই মনকে তারা দমন করতে পারে, এবং তা তারা করে লোক দেখাবার জন্য নয়। তারা করে, কারণ ভাল থাকা নিয়ে তাদের কোনও বিশেষ চাহিদা বা তার প্রতি আসক্তি নেই। অর্থাৎ, এটার জন্যই তারা কাজ করে, ব্যাপারটা তা নয়। আর, তা করে না বলেই, যে কমরেডরা কষ্ট স্বীকার করে দলের কাজ করছে, তারা তাকে মনের থেকে কমরেড বলে গ্রহণ করতে পারে। আবার, যারা কষ্ট স্বীকার করে কাজ করছে তারা যদি তেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমরেড না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে নেতিবাচক দিকগুলি আছে, দুর্বলতার দিক আছে, তার ফলে একজন ভাল কমরেডও মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তে পারে। এখন, একজন নেতৃস্থানীয় কমরেড প্রতিমুহূর্তে যদি তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধা নিয়ে অসন্তোষ দেখান, তাঁর কত অসুবিধা সেটাই প্রকাশ করতে থাকেন, তাহলে যারা না খেয়ে কাজ করে তারা মনে জোর পাবে কোথায়?

সুতরাং, কাজ করা মানে কি কতকগুলো বক্তৃতা করা, আর কতকগুলো লোকের সঙ্গে মিশতে পারা? এর নাম কি ভাল কর্মী, বিপ্লবী কর্মী? বিপ্লবীদের প্রধান কথা হল, সে পার্টির রাজনীতি ভাল বোঝে এবং স্বেচ্ছায় ডিসিপ্লিন মেনে চলে। সে জানে, কীভাবে শৃঙ্খলার সাথে আচরণ করতে হয়। নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে, নিজের উপর তার কন্ট্রোল আছে এবং সে ডিসিপ্লিন অনুযায়ী কাজ করে।

এখন, পার্টির যত শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে তত এটি আমাদের একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি কমরেডের দিকে নজর দেওয়া নেতৃত্বের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। কঠিন যে হচ্ছে, সেটা আমরা বুঝি। দল যখন ছোট থাকে, একটা ছোট গোষ্ঠী থাকে, তখন প্রত্যেকটি কমরেডের উপর নজর দেওয়া যায়। কিন্তু, দল যত বড় হতে থাকে তখন যারা ঘটনাচক্রে নেতৃত্বের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে তাদের উপরে যতটা নজর পড়ে, যারা সব সময় আশেপাশে ঘোরাফেরা করে না তাদের উপর ততটা নজর পড়ে না। আবার, যারা আশেপাশে ঘোরাফেরা করে আগে তাদের উপর যতটা নজর দেওয়া সহজ হতো, কাজকর্মের বিস্তৃতির ফলে আজ তাও সম্ভব নয়। এ কারণেই সমগ্র পরিবেশটি এমন হওয়া দরকার এবং প্রতিটি নেতা, কর্মী, সংগঠকের কর্মপ্রণালী এমন হওয়ার দরকার যাতে একের আচরণ অপরকে শেখায়, একের ডিসিপ্লিন অপরকে ডিসিপ্লিন সম্পর্কে ভাবায়।

আবার, অনেক সময় দেখা যায়, গুরুতর আলোচনার ক্ষেত্রে অনেকে গল্পগুজব ঠাট্টা করেন, ইয়ারকি করেন। বিপ্লবীরা ঠাট্টা করে, মানে কি ইয়ারকি করে? ইয়ারকির একটা আলাদা মানসিকতা আছে, তা ডিসিপ্লিনের ভিতকে আলগা করে দেয়। অনেক সময় নেতারা কথা বললে, সমালোচনা করলে দেখা যায়, একজন কর্মী আরেকজনের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপেন, মুচকি হাসেন। ভাবখানা এমন যে, কত কথা আর শুনব, কত সমালোচনা আর শুনব — মানে, সমালোচনা এমন একটা কিছু নয়, ও বলেই থাকেন নেতারা। এইরকম কর্মীও কিছু আছে। তাদের এইসব আচরণ আমার চোখে যতটুকু পড়ে তার থেকেই বোঝা যায় যে, আমার চোখের সামনেই যা ঘটে তা যদি এই হয়, তাহলে বাস্তবে এর ব্যাপকতা আরও অনেক বেশি। আবার অনেকে ভাবেন, তাঁরা বেশি বুদ্ধিমান। তাঁরা হয়তো ভাবেন, আড়ালে গিয়ে চোখটি টিপলে বা সমালোচনার সময় মুখখানা গম্ভীর করে চলে গেলে সকলে মনে করবে, তিনি খুব গুরুত্বের সাথে নিলেন ব্যাপারটা। কিন্তু, যাঁরা বোঝার তাঁরা বোঝেন। পার্টি নেতৃত্ব এত দুর্বল নয়। তাঁরা এসব বুঝতে পারেন।

ব্যক্তিগত উদ্যোগই যৌথ উদ্যোগের বুনিয়াদ

আমি এই সমালোচনাগুলো করছি এই জন্য যে, আজকে আমরা যে জায়গায় এসেছি, এটা একটা উত্তরণের সময়। পার্টি জোর কদমে এগিয়ে যাওয়ার মতো জায়গায় এসেছে। আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অনেক কর্মী আমাদের। কিন্তু, অনেকেরই ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেই। অনেকে বল ভরসা পাচ্ছে না। বিপ্লবী কর্মীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে; কিন্তু আলোচনা করে মানে পরস্পরকে কাজ করার সাহস জোগায় একত্রে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য, দায়িত্ব পালন করবার জন্য। আরেক ধরনের আলোচনা আছে, তাহল, কেন

পারব না, কিসের জন্য পারব না, না পারার পেছনে কী কী কারণ, বা যুক্তি কী, সেগুলো বড় করে দেখানোর জন্য আলোচনা করা। এ ধরনের আলোচনা কর্মীদের উদ্যোগ নষ্ট করে, কর্মক্ষমতা মেরে দেয়; তাদের পার্টিজীবনের সামনে সামগ্রিকভাবে যে সম্ভাবনাগুলো দেখা দেয়, তাকে নষ্ট করে দেয়।

তাহলে এই কি আমাদের আলোচনার বা আমাদের মেলামেশার উদ্দেশ্য হবে? কমরেডদের মধ্যে মেলামেশার উদ্দেশ্য হল, আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে সেগুলো কাটিয়ে আমরা যা পারব না বলে ভাবছি তা করার দায়িত্ব যদি আমাদের উপর আসে সাহসের সঙ্গে তা গ্রহণ করা এবং তার জন্য চেষ্টা করা। আমরা বসে আড্ডা দিই একে অপরকে উৎসাহিত করার জন্য বা ভয় ভাঙাবার জন্য, অপরের মধ্যে উদ্যমের অভাব থাকলে তা দূর করবার জন্য, উদ্যম গড়ে তোলার জন্য, উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য। তা না হলে যৌথ উদ্যোগ কথাটার কোনও মানে থাকে না। যৌথ উদ্যোগ একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, প্রাণহীন হয়ে দাঁড়ায়, যদি না তার মূলে থাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ। ব্যক্তিগতভাবে যে যেমন সচেতন কর্মীই হোন, তিনি বিপ্লবী হয়েছেন মানেই তিনি তাঁর পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে সাহস করেন, সৎসাহস রাখেন। তিনি বুঝেছেন, একজন সচেতন মানুষ হিসাবে তাঁর পরিবেশকে পরিবর্তন করার, তাকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতেই হবে। এর জন্য তিনি কোনও অজুহাত দিতে পারেন না, পালিয়ে যেতে পারেন না। তাঁকে পরিবেশ পরিবর্তন করার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ, ব্যক্তিগত উদ্যোগই যৌথ উদ্যোগের বুনিয়াদ। প্রতিটি বিপ্লবী কর্মীকেই এভাবে চিন্তা করতে হবে।

'আমি সচেতন' এইজন্যই যে, আমি সচেতনভাবে নিজেকে এবং পরিবেশকে পরিবর্তিত করার জন্য তৈরি। এই তৈরি যদি আমি না থাকি, তাহলে আমি সচেতন নই। ডিকশনারির ভাষায় হয়তো আমি শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী; কিন্তু আসলে আমি সচেতন নই। একজন সচেতন মানুষ তাঁর উদ্যোগ ছাড়তে পারেন না। একজন সচেতন মানুষ শুধু আলোচনাই করেন না, সচেতন মানুষের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকে এবং সেই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। এ ব্যাপারে তিনি কারওর কাছে অজুহাত দিতে পারেন না, নিরর্থক জবাবদিহি করতে পারেন না। লড়াই করে তিনি হারতে পারেন, পরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যর্থ হতে পারেন। কিন্তু, তাঁর ব্যর্থতার সমস্ত জিনিসটাই মাথা উঁচু করে তিনি দুনিয়ার কাছে রাখতে পারেন। কারণ, তিনি ফাঁকি দেননি। তিনি বসে বসে কেবল আলোচনা করেননি। কেন করতে পারছেন না, বা কীসের জন্য করতে পারছেন না, শুধু তার কারণ খুঁজে বেড়াননি। তিনি চেষ্টা করেছেন, লড়াই করেছেন, উদ্যোগ নিয়েছেন, তারপর ব্যর্থ হয়েছেন। বিপ্লবীদের চিন্তা, মানসিকতা এরকম হবে। আমরা তো একদিন ব্যর্থতার মধ্যেই শুরু করেছিলাম। আপনাদেরও ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে। আরও কত ব্যর্থতা আমাদের সামনে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু, আমরা নিশ্চিত যে শেষপর্যন্ত আমরা জয়ী হবই। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, আমরা সঠিক। আমরা সঠিক রাস্তায় চলছি। প্রতিটি ব্যর্থতা থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে পারি, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এইভাবেই সব দেশে বিপ্লব জয়ী হয়েছে — ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা, আবার ব্যর্থতা, এবং তারপর শেষ পর্যন্ত জয়। এ প্রসঙ্গে মাও সে-তুঙের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেছেন, ইতিহাসে বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতারই বারবার পুনরাবৃত্তি হবে তা হতে পারে না, তা কখনও হতে দেওয়া যায় না। ব্যর্থতাকে অবশ্যই জয়ে পরিবর্তিত করতে হবে।

সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বিপ্লবী চরিত্রের গুণাবলী গড়ে উঠতে পারে

একদল এমনও মনে করেন, বিপ্লবী তত্ত্ব তাঁদের ঠিক, কিন্তু কর্মী তৈরি করার বোধহয় আলাদা উপায় আছে। তাঁদের এ ভাবনাটা আমার অদ্ভুত লাগছে। আমি তাঁদের কথা বোঝার চেষ্টা করছি। কিন্তু, তাঁরা একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না। তাঁরা মনে করছেন যে, লেনিন যে আমাদের ব্যক্তিগত আচরণবিধি হিসাবে কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেই আচরণগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলেই আমরা রাজনীতি ঠিক বুঝতে পারব, বিশ্লেষণও ঠিক হবে এবং সব কিছু সঠিক পথে হবে। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, এই আচরণবিধিগুলো বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার বুনিয়াদ ঠিকই, বিপ্লবী চরিত্র ও কর্মী গড়তে না পারলে বিপ্লব হবে না, একথাও ঠিক; কিন্তু, তার উপর আর একটি কথা আছে। এই চরিত্র ও কর্মী গড়ে উঠবে কী করে? কেউ ভাবলেই, মনে করলেই, বা মন্ত্র জপলেই তা হবে? না, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এ কথার অর্থ তাঁকে

বুঝতে হবে। তিনি কি জানেন, তিনি নিজে কতরকম বিরুদ্ধ আচরণ করেন? বিপ্লবী আচরণবিধির কথা বলতে বলতেই তিনি কতরকম বিরুদ্ধ আচরণ করেন এবং বিরুদ্ধ আচরণ যে করছেন, বিরুদ্ধ মানসিকতা যে লালনপালন করছেন তা বোঝবার ক্ষমতাও তিনি অর্জন করতে পারবেন না, যদি তিনি সঠিক পদ্ধতিতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের তত্ত্বগত উপলব্ধি ও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে না তোলেন। আর, বিপ্লবী চরিত্রের এই গুণাবলী যদি জীবনে সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে হয়, তাহলে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে নিষ্ঠার সাথে রাজনৈতিক আন্দোলন করলেই এই গুণাবলী গড়ে উঠতে পারে। না হলে আমরা শুধু মুখে বিপ্লবী চরিত্রের গুণাবলীর কথা বলব, কাজে তা গড়েই উঠতে পারবে না এবং তখন বিপ্লবী আচরণবিধি পালনের প্রশ্নটা বাস্তবে আচরণবাদিতায় পর্যবসিত হবে।

আমাদের সামনে অনেক সমস্যা। যেমন, কর্মী সংগ্রহ এবং কর্মীদের তৈরি করার সমস্যা। এ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে, আজ সব কথা বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলছি যে, সঠিক তত্ত্ব আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তিনটি ত্রুটি ভয়ানকভাবেই দেখছি। এক হচ্ছে, অনেকের অনেক ক্ষমতা আছে, কিন্তু নিজেদের গুণ তাঁরা কাজে লাগাচ্ছেন না। কারণ, তাঁদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব কী, কী দায়িত্ব নিলে তা সঠিকভাবে তাঁরা পালন করতে পারেন, তাঁরা সেটি জানেন না, বা করেন না। এরকম ব্যাপার দলের মধ্যে অনেক সময় ঘটে। কিন্তু, আমাদের উদ্যোগ থাকলে, চেষ্টা থাকলে, আজ অন্যায় বা ভুল হলেও, কাল তা শুধরে যাবে। আবার, সব মানুষই অন্যায় বা ভুল করবে, একথা মনে করার কোনও কারণ নেই। মূল তত্ত্বগত বা আদর্শগত প্রশ্নে যখন কোনও বিরোধ নেই তখন প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ শুরু করুন, ব্যক্তিগত উদ্যোগেই শুরু করুন, নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করুন। প্রত্যেকে তাঁর তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন কিনা, সেটাই প্রধান কথা। অথচ, অনেক কমরেডকে দেখছি যে, তাঁরা নিজেরা নির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না, বরং গোটা দলের দায়িত্ব নিয়েই তাঁরা বেশি ভাবেন। তাই যদি হবে, তাহলে তাঁদের তো আমাদের জায়গায় আসা দরকার। তাহলে তাঁদের জায়গায় কে কাজ করবে? সে জায়গায় তাহলে আমরাই যাই? এখন, একথা শুনে কেউ তৎক্ষণাৎ বলতে পারেন, তিনি যে জায়গায় কাজ করছেন সেই জায়গায় কাজ করার লোক তিনি নন, তাঁর জায়গায় আমরা যাই, তিনি আমাদের জায়গায় আসবেন। একথা বললে তবুও তার একটা মানে হয়। না হলে নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ না করার কী অর্থ থাকতে পারে?

আমাদের দলে প্রত্যেক কমরেডই দলের কাছে তাঁর মতামত রাখতে পারেন। কিন্তু, তিনি নিজের কাজটা তো আগে করবেন। অর্থাৎ, নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করাটাই তাঁর কাছে প্রথম। একজন নিজে দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করছেন, তারপর তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই পার্টির কাছে কিছু মতামত রাখছেন, পার্টির সাধারণ রাজনীতি ও নীতি সম্পর্কে সবসময় নানা মতামত দিচ্ছেন। এরকম ঘটলে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু, আমি দেখছি, অনেকে পার্টির কোন কাজটা ঠিক হল, কোনটা ঠিক হল না, সে সম্পর্কেই সবসময় মাথা ঘামাচ্ছেন, কিন্তু, নিজের কোনও দায়িত্ব আছে কিনা সে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন না। অথচ, প্রতিটি কর্মীরই তো এইভাবে ভাবা উচিত যে, যতটুকুই হোক, সীমিত হলেও তাঁর একটা দায়িত্ব আছে, কর্মক্ষেত্র আছে। সেই কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করে তিনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করছেন, তিনি শুধু ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছেন না। আর, যেখানেই যান সেখানেই পার্টি কমরেডদের সাথে, বা যত বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে সেখানে কেবল আলোচনা করে বেড়ানোই তাঁর কাজ নয়। অবশ্য এই আলোচনার মধ্য দিয়েও দলের একটা উদ্দেশ্য সফল হতে পারে, যদি যাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছেন, এর মধ্য দিয়ে তাঁদের দলের সাথে যুক্ত করেন। অর্থাৎ, এইভাবেই তিনি কর্মী সংগ্রহ করছেন এবং দলই সে দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেছে, সেটাই তাঁর কাজ। কিন্তু, আসলে তিনি তাই করছেন কি? না, সেভাবেও কিছু করছেন না। শুধু আলোচনা করছেন এবং সারাদিন তাতেই ব্যস্ত থাকছেন। এর ফলে হচ্ছে কী? নেতৃত্ব দিতে পারে এমন অনেক যোগ্য কর্মীদেরও ক্ষমতার অপব্যয় হচ্ছে।

‘মুড ভাল নেই, তাই কাজ হয় না’ এটা বিপ্লবী শৃঙ্খলাবোধের পরিপন্থী

দ্বিতীয়ত, বহু দায়িত্বশীল কমরেড আছেন, যাঁরা ভাল কাজ করেন। কাজ যদি করেন, সুন্দরভাবেই করেন। কিন্তু, কাজ করবেন কি করবেন না, তা তাঁদের মুড-এর (ভাললাগা-মন্দলাগা) উপর নির্ভর করে এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকা সত্ত্বেও ‘মুড ভাল নেই’ এই মনোভাব তাঁরা যত্রতত্র প্রকাশও করে থাকেন। সাধারণ কমরেডরা

সেগুলো দেখে ও শোনে। এঁরা একবারও ভাবেন না যে, দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে এ ধরনের কথা বললে বা আচরণ করলে তা সাধারণ কর্মীদের উপর কী প্রভাব ফেলে? সাধারণ কর্মীরা, সমাজ থেকে যাদের চরিত্রে অনেক কাদামাটি জমে, তাদের উপর এবং আন্দোলনের ও জনসাধারণের উপর এ ধরনের আচরণ কত বড় আঘাত হানে — একথাটা তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না। এসব কমরেডরা তাঁদের ভাল কাজের দ্বারা পার্টিকে যতটুকু সার্ভিস দেন, এরকম অসতর্ক কথার ও আচরণের দ্বারা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি অনেক সময় তাঁরা করে বসেন। অথচ, এ কাজ তাঁরা করেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, আসলে তাঁরা পার্টির ক্ষতি করতে চান না। কারণ, তাঁরা বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মহৎ কাজের আবেদনেই দলে এসেছেন। কিন্তু, এই সংযমটুকু তাঁদের নেই, নিজের উপর এই কন্ট্রোল তাঁদের নেই। কষ্ট তাঁদের হয়, কিন্তু সেটুকু সহ্য করার ক্ষমতা তাঁদের না থাকলে সাধারণ কর্মীরা তাঁদের কাছ থেকে কী শিখবে? কষ্ট স্বীকার করবার, সহ্য করবার শিক্ষাটা একটা বিপ্লবী শিক্ষা। বিপ্লবীর তো এরকম হয় না যে, তাকে কোনওরকম ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট স্বীকার করতে হবে না। এরকম একটা নির্ঝঞ্ঝাট পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত যদি রাখা হয় তবেই আমি বিপ্লবটা করতে পারব, তা নাহলে আমি বিপ্লবী আন্দোলনটা করতে পারব না — এরকম চিন্তা দিয়ে তো বিপ্লব হয় না, আর বিপ্লবী হওয়াও যায় না। ফলে, যে কোনও অবস্থার জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এইভাবে তৈরি হতে সময় লাগতে পারে, কিন্তু তাঁকে চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা করবার অর্থ এ নয় যে, মুখে চেষ্টা করছি বলে কাজে তিনি উল্টোটাই করবেন। এই চেষ্টা করবার প্রথম পদক্ষেপ অন্তত এই হবে যে, আগে তিনি যে আচরণ করতেন, অন্তত যেরকমভাবে যত্রতত্র যে কোনও মনোভাব প্রকাশ করতেন, তা বন্ধ করেছেন। তিনি অন্তত আর তা করেন না। তারপরও করেন, নিজে যখন আর পারছেন না তখন করেন, কিন্তু নেতৃত্বের কাছে করেন, যত্রতত্র নয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পার্টির যে কোনও স্তরেই হোক একটা দায়িত্বশীল পদে আছেন ততক্ষণ দলের সাধারণ ও অন্যান্য কর্মীরা তাঁকে ঠিক নেতার মতো দেখে। ফলে, তাঁর আচরণের প্রভাব অন্যদের উপর বর্তায়। তাই তাঁর ভিতরে কী দুর্বলতা আছে, কী ত্রুটি আছে, তা যদি তিনি জানেন, তবে সেগুলোকে উদ্‌ঘাটিত করে দূর করার জন্য তা তিনি আলোচনার বিষয় হিসাবে আনবেন, কিন্তু, এমন সমস্ত কমরেডদের কাছে নয়, যারা তাঁকে সাহায্য তো করতেই পারবে না, বরং সহানুভূতি দেখিয়ে ক্ষতি করবে। এসব ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সাথে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিডারশিপের সাথে আলোচনা করে বিষয়টাকে সমাধান করাই শ্রেয়।

এখন, আরেক দল কমরেড আছে যাদের মধ্যে দু'ধরনের কর্মী আছে। একদল যাদের কোনও কাজ দিয়ে যদি বলা যায়, এটা কর — যা করতে বলবেন, সেটা করবে। আর একদল আছে, যারা কখনও কখনও করবে, কখনও আবার 'দূর, মুড ভাল লাগছে না' বলে বসে থাকবে। এইসব কর্মীদের বোঝা দরকার যে, অনেক জিনিস আছে যা আমাদের ভাল লাগে না। কিন্তু, আমাদের ভাল না লাগলেই আমরা যেমন তেমন আচরণ করলে যোগ্য কর্মী, বিপ্লবী কর্মী তো দূরের কথা, একটা সাধারণ শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজনৈতিক কর্মী হওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

যথার্থ ভালবাসা মানুষকে উদার করে, বড় করে, সাহসের সাথে লড়তে শেখায়

প্রথম কথা হল, তত্ত্ব বোঝা মানে কতকগুলো বড় বড় কথা শেখা নয়। কোন তত্ত্ব বোঝারই কোনও মূল্য নেই যদি ডিসিপ্লিন না থাকে, যদি তা কাজ করতে না শেখায়। তত্ত্ব প্রকৃত বোঝার অর্থ, কীভাবে সুশৃঙ্খল আচরণ করতে হয় তা শেখা। কীভাবে আচরণ করতে হয় তাই শিখছেন না, আচরণ করছেন উল্টো, আর মনে করছেন, খুব বড় জিনিস বুঝেছেন, তা কখনও হয়? তার মানে বুঝছেন সব গোলমেলে জিনিস। বুঝছেন বলে মনে করছেন, কিন্তু আসলে বাজে জিনিস বুঝছেন। শিখছেন না কিছুই। যতটুকু ঠিক বুঝছেন ততটুকু সংযমী হবেন, সুশৃঙ্খল হবেন, আচরণে তা প্রকাশ পাবে, ততটুকু ঠিক আচরণ করবেন, ততটুকু পরিমিতি জ্ঞান হবে। বেশি বোঝার মানে তো এই যে জ্ঞান বেশি হবে, বেশি সংযমী হবেন, নিজের উপর বেশি নিয়ন্ত্রণ আসবে, বেশি সহ্য করবার শক্তি আসবে। শেখবার ফল ও প্রক্রিয়া হল এটাই।

দ্বিতীয়ত, আমাদের কর্মীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় হলেও কিছু কর্মী আছে, যারা কালেকশন করতে বেরোল তো দু-পা করে আর তাদের ভাল লাগে না। তাদের এই আচরণে, যারা তাদেরই আশেপাশে আছে, দিন-রাত কালেকশন করে মুখে রক্ত উঠে গেলেও বলে, আমরা করব, তাদেরও উৎসাহ নষ্ট হতে পারে। এদের উপর যদি নেতৃত্বের সর্বদা নজর না থাকে, গাইডেন্স না থাকে, এদের বিপ্লবী চরিত্রের যদি একটা বুনিয়াদ না থাকে,

তাহলে কী হয়? দিন কতক করার পর দেখা যায়, দু'মিনিট কালেকশন করছে তো তারা তিন মিনিট আড্ডা দিচ্ছে। তাদের পড়ে থেকে কাজ করবার মনোভাব নেই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেই। দেখা যায়, সংখ্যায় খুব কম হলেও এইসব কর্মীরা কিছুক্ষণ কালেকশন করল তো দু-মিনিট ময়দানে বা পার্কে গিয়ে বসল। ছেলেমেয়েরা গল্প-গুজব করে ভাল, কিন্তু কাজের সময় পার্কে গিয়ে বসতে দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কাজ ফেলে পার্কে কেন? কাজ কর, তারপর পার্কে বস, যত ইচ্ছা বস, কে আপত্তি করছে? দায়িত্ব বহন কর, তারপর পার্কে বস, গল্পগুজব কর। ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে গল্পগুজব করতে ভালবাসে, সে তো ভালই। কিন্তু, কাজ উপলক্ষ করে, কাজ ফাঁকি দিয়ে তা হবে কেন? অথচ দেখি, সবার আড়ালে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ হয়ে যায়। কেউ কিছু জানতে পারছে না, কিন্তু, কেমনভাবে দু'জনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যায়। আর, সেসময় কাজ থাকলে তা ফাঁকি দেওয়ার জন্য সময়মতো শরীরটাও খারাপ হয়ে যায়। কেন? না, আর একজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার। দেখা করার দরকার যদি হয়, তার জন্য শরীরটা খারাপ করার দরকার কী? সোজাসুজি বল যে, আমার দেখা করার দরকার, পার্কে যাব। না, বলে শরীরটা খারাপ। এতে চরিত্রের অধঃপতন হয়। যে মানুষ যা হতে পারত, সে তা হয় না। গোপনীয়তার আশ্রয় নেওয়ার ফলে তার চরিত্রের সমস্তটাই যে নষ্ট হয় তা নয়, কিন্তু সে যা হতে পারত তা হতে পারে না, অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এ জিনিস চলবে না। কেউ তো পরস্পরের ভালবাসায় বাধা দিচ্ছে না। সোজাসুজি, সরাসরি ও সাহসের সঙ্গে মানুষের মতো তাকে গ্রহণ কর। তাতে তুমি হবে আরও দায়িত্ববান, আরও বড়, আরও আনন্দিত। কিন্তু, এরকমভাবে নিতে না পারলে কী হয়? তাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। এমনকী কমরেড যারা, যারা তার কমরেডস-ইন-আর্মস, যারা তার জন্য এক সঙ্গে জীবন দিতে পারে, তারাও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে না।

পরস্পরের সম্পর্ক যেখানে কাজ ও দায়িত্ব ভুলিয়ে দেয়, বাজে অজুহাত দিতে শেখায়, দায়িত্বহীন আচরণ করতে শেখায়, সেটা কি সুস্থ সম্পর্ক? নাকি অসুস্থ সম্পর্ক? তা কি মানুষের সম্পর্ক? সে তো পোকামাকড়ের সম্পর্ক। মানুষের সম্পর্ক মানুষকে আরও উন্নত করবে। ভালবাসা যদি হয় তা মানুষকে উদার করবে, মহৎ করবে, ভণ্ডামি থেকে মুক্ত করবে, সাহস দেবে, চরিত্র দেবে, সোজা জিনিসকে সোজাভাবে গ্রহণ করতে শেখাবে।

বিপ্লব করতে হলে চাই সুশৃঙ্খল আচরণ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, তেজ এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ক্ষমতা

তাই যে কথা বলছিলাম, কর্মী পাওয়া ও তাদের উপযুক্তভাবে তৈরি করা, এটা একটা সমস্যা। নেতাদের এদিকটায় নজর দিতে হবে। সাধারণ কর্মীরাও কখনই উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রশ্রয় দিতে পারে না। যে সংগঠনে শৃঙ্খলা নেই, তা যদি দশ লক্ষ লোকেরও সংগঠন হয় তা হয় মেছোবাজার, তাতে দেশের কিছু ভাল হয় না। তারা কোনও দিন বিপ্লব করতে পারে না।

আপনারা দশ লক্ষ লোক জড়ো করেও যদি এরকমই থাকেন, তাহলে বিপ্লব আপনাদের দ্বারা হবে না, এ আমি লিখে দিতে পারি। বিপ্লবী দল দশ লক্ষ লোকের কম নিয়ে, এমনকী এক লক্ষ লোক নিয়েও বিপ্লব করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস, যদি সে দল সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল হয়, তার প্রতিটি কর্মী শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়, তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকে, বিপ্লবীসুলভ আচরণ থাকে, তেজ থাকে ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। তারা ঝুঁকি নিতে পারে, কোনও অবস্থাতেই দিশাহারা হয় না, এবং সব অবস্থায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার জন্য, রাজনীতির দিক থেকে, তত্ত্বের দিক থেকে, শরীর ও মনের দিক থেকে তারা নিজেদের তৈরি করেছে। দলের প্রত্যেকটি কর্মী যদি এরকম হয়, তাহলে এক লক্ষ কর্মীর পার্টি ভারতবর্ষে বিপ্লব জয়যুক্ত করতে পারে। এই দিকে লক্ষ রেখে আপনাদের ভাবতে হবে।

আপনারা বুঝতেই পারছেন, এটা আমি আমার নিজের দলের সমালোচনা করছি। এখানে আমার সমালোচনার লক্ষ্য অন্য কোনও দল নয়। আমার দুশ্চিন্তা কী নিয়ে, কী আমাদের করা উচিত, তা আমি বললাম। প্রতিটি কর্মীরই এতে সাড়া দেওয়া উচিত। যদি তাঁরা সাড়া না দেন, তাহলে মেছোবাজার হবে, তা দিয়ে বিপ্লব হবে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিপ্লব করা যায় না। বিপ্লবের প্রতিটি মানুষ হবে সচেতন, সক্রিয় ও সুশৃঙ্খল। নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে এটা অনেকের কাছে 'ধান ভানতে শিবের গীত' মনে হতে পারে। কিন্তু, আজ আমাদের কাছে এটাই নভেম্বর বিপ্লবের বাস্তব শিক্ষা। কারণ, নভেম্বর বিপ্লব যে

বিপ্লবীদের তৈরি করেছিল, তারা প্যানপ্যানে ছিল না, ভণ্ড ছিল না। এসব নিয়ে নভেম্বর বিপ্লব করা সম্ভব হয়নি। যারা নভেম্বর বিপ্লব করেছে, তারা যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা ভালবাসা, নরনারীর সম্পর্ককে বিপ্লবের থেকে, দলের থেকে বড় স্থান দেয়নি। আমরাও বক্তৃতায় দিই না, আলোচনার সময় দিই না, কিন্তু কাজে ও আচরণে দিই, ব্যবহার করি সেরকম। ফলে, দায়িত্ববান আমরা হতে পারি না, আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যায়।

কাজেই আপনাদের সামনে আমার বক্তব্য, কর্মী তৈরি করা এবং ডিসিপ্লিন শেখানো ও রক্ষা করা আমাদের এখন খুব দরকার। আজ আমরা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ছোট হলেও, একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছি। কিন্তু, আজ আমাদের সামনে বড় জরুরি হয়ে দেখা দিচ্ছে ডিসিপ্লিন, কর্মপদ্ধতি ও কর্মীদের তৈরি করার প্রশ্নটা। না হলে, এত সব ভাল বিশ্লেষণ ও সঠিক রাজনীতি নিয়েও আমরা আর এগিয়ে যেতে পারব না। অর্থাৎ, গোড়াতে অত অল্প লোক নিয়ে যে কদমে আজকে এতদূর এগিয়ে এলাম, তার তুলনায় এত বেশি লোক নিয়ে যে কদমে এগোনো দরকার, সেই কদমে আমরা এগোতে পারব না। অথচ, বাস্তব অবস্থা যা, তাতে আমরা জোর কদমে এগিয়ে যেতে পারি। মেকি প্রগতিশীলরা ভাঙছে, এবং প্রতিক্রিয়া এখনও পুরো আসর জমাতে পারেনি। বিপ্লবীদের কদমে কদমে এগোবার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু, এভাবে এগোতে হলে তত্ত্ব এবং রাজনীতি চাই, তার সঙ্গে চাই, ডিসিপ্লিন, বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি, কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, চরিত্র এবং কাজ করবার অদম্য স্পৃহা। এইটুকু বলেই আজকে শেষ করলাম।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ
এস ইউ সি আই জিন্দাবাদ

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৫১তম বার্ষিকী
উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের ১৫ নভেম্বর
কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে
প্রদত্ত ভাষণ। ২০০১ সালের ১০ নভেম্বর
দলের বাংলা মুখপত্র গণদাবীর
নভেম্বর বিপ্লব বিশেষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।